Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501060 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Kamalakanta, the Poet of Sakta Padavali: A Study
শাক্ত পদাবলির কবি কমলাকান্ত: একটি সমীক্ষা

Sayantan Mondal
Researcher
Bengali Department
Visva-Bharati

Received on: 10th June 2026
Accepted on: 24th June 2026

Abstract:
Shakta Padabali is a valuable treasure of Bengali literature. The journey of Shakta Padabali began in the second half of the 18th century. The social, political, and economic conditions of that time played a decisive role behind its emergence. Ramprasad Sen can be called the pioneer of this tradition. Kamalakanta Bhattacharya was Ramprasad's worthy successor. He dedicated his life to the worship of the Mother's feet. He was a poet, a mystic, and an artist. His songs show the emotion of devotion, musical essence, and refined artistic excellence. The poet's ancestral home was in Ambika-Kalna, in present-day East Burdwan district. Kamalakanta had a close relationship with the Burdwan royal court at that time. He adorned the important position of court scholar in Maharaja Tejchandra's assembly. Even though he was a court poet, the glamour of the royal court could not distract him, nor could it stop his sincere literary practice. He achieved excellence in composing Agamani and Bijaya songs. Writing Shakta songs was like a spiritual practice to him. Sitting in the seat of a meditative devotee, he continued that practice till his last breath.

Key Words:
শাক্ত পদাবলি, মাতৃসাধক, শক্তি সাধনা, রাজসভার কবি, উত্তরসাধক, সাধক-কবি, জগজ্জননী, মাতৃহৃদয়, বিরহবেদনা, আগমনী, বিজয়া

মূল প্রবন্ধ

সূচনাকাল থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতকের শেষলগ্ন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য মূলত ছিল ধর্মনির্ভর। বৈষ্ণব পদাবলির স্থান ছিল ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্যের শীর্ষে। বৈষ্ণব পদাবলি, মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ, পাঁচালির পাশাপাশি রচিত শাক্ত পদাবলি নিজের স্থানটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল। শাক্ত পদাবলির মূল উপজীব্য ছিল বাৎসল্য রস যা বৈষ্ণব পদাবলির মূল উপজীব্য শৃঙ্গার রসের থেকে পৃথক। একসময় রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা বাংলা সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করলেও সময়ের বিবর্তনে ক্রমশ তা নিজের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে এবং ধীরে ধীরে মাতৃদেবীর পূজার্চনা সমাজে প্রভাব বিস্তার করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রামপ্রসাদী সংগীতের আবেগ-জড়িত আবেদনের মধ্য দিয়ে শাক্ত পদাবলির উদ্ভব। অবশ্য এইসময় শাক্ত পদাবলির যে বিকশিত, পরিণত রূপ আমাদের চোখে পড়ে তার সূচনা অনেক আগেই হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর সূচনা থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বৈষ্ণবীয় ভাব ও কাব্যের প্রভাবে বাঙালির হৃদয়-

© Santiniketan Sahityapath

মন আচ্ছন্ন থাকায় শক্তিদেবীর মাহাত্ম্যধর্মী কোনো কাব্য বাংলার জাতীয় জীবনে সেভাবে আলোড়ন তুলতে পারে নি। সমগ্র বাঙালি সমাজ প্রায় দুশো বছর চৈতন্য-ভাবে নিমগ্ন ছিল। অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় দশকে কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা, নবাবদের ভোগবিলাসমত্ত উচ্ছৃঙ্খল জীবন ও কুশাসনে দেশব্যাপী অরাজকতা সৃষ্টি হয়; সমাজজীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। এমন এক অস্থির পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ স্বভাবতই অভয়দায়িণী এক আশ্রয়ের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে, যা তাঁদের সর্ববিপদ, দুঃখ, যন্ত্রণা, হতাশা থেকে রক্ষা করবে। বৈষ্ণব পদাবলির মধুর রসের মধ্যে তাঁরা সেই আশ্রয়, শক্তি, সাহস খুঁজে পেলেন না। অত্যাচার ও দুর্দশার প্রবল পীড়নের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কালভয়হারিণী জগজ্জননী দেবী কালিকাকে আরাধ্য মেনে শাক্ত কবিরা শাক্ত পদাবলি রচনা করলেন। প্রসঙ্গাক্রমে অরুণকুমার বসুর মন্তব্য স্মর্তব্য:

"অষ্টাদশ শতাব্দী বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক ইতিহাসে ঘন কালো দুর্যোগের মসিলেখা এঁকে দিয়েছিল। তখনই জাতীয় জীবনের সহস্রবিধ অপমানে নিষ্পেষিত, হতাশা ও নৈরাশ্যের অতলগহ্বরে নিক্ষিপ্ত মানবাত্মা এমন এক বরাভয়দাত্রী ভীষণা দেবীর মূর্তি কল্পনা করেছে, যিনি জীবনের অনিশ্চিত দুর্ভাগ্যের উপর শান্তির প্রলেপ দিতে পারবেন, উচ্ছৃঙ্খল ব্যর্থতাকে একটি ঐক্যসূত্রে বেঁধে দিতে পারবেন।"[১]

তাঁরা যে বরাভয়দাত্রী দেবী মূর্তির কল্পনা করেন, তিনিই দেবী কালিকা। জাতীয় জীবনের চরম অন্ধকার দিনে সমগ্র জাতিকে প্রবল হতাশা, সুতীব্র জড়তা, নৈরাশ্য থেকে মুক্তির জন্য শাক্ত পদকর্তারা আশ্বাস, আত্মিক বল ও নির্ভরতার এক অদ্ভুত ভাবলোক সৃষ্টি করেন। তাঁদের পদের মাধ্যমে কবিরা আপামর জনসাধারণকে মাতৃমন্ত্রের দৃঢ় জীবন চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করতে প্রয়াসী হন। কাকে বলব শাক্ত পদাবলি এইপ্রসঙ্গো প্রাবন্ধিকের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য, "মাতৃমহিমাবাচক ও মাতার উদ্দেশে প্রার্থনাবাচক পদকে শাক্ত পদ বলায় কোনো ভ্রান্তি নেই। আর এই পদের সংকলনকে শাক্ত-পদাবলি বলাও তাই অসংগত নয়। শ্যামাসংগীত না বলে যে শাক্ত-পদাবলি বলা হয় তা বৈষ্ণব পদাবলির প্রভাবেই। বস্তুত শাক্ত পদাবলি শব্দটি বৈষ্ণব পদাবলির সাদৃশ্যে একালের সাহিত্য সমালোচক রসজ্ঞ কাব্যতত্ত্ববিদ্ মানুষ তৈরি করে নিয়েছেন।"[২]

শক্তিবিষয়ক সংগীত বা শাক্ত পদাবলি শুধু মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। একদিকে মাতৃনামের মহিমাব্যঞ্জনা অপরদিকে জীবননিষ্ঠ সুরের বৈচিত্র্য, মাধুর্যমণ্ডিত কবিত্বের স্পর্শে পদগুলি অনন্যসাধারণ। বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ শাক্ত পদাবলি মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক নিদর্শন। শাক্ত পদাবলির দুটি ধারা — উমাসংগীত ও শ্যামাসংগীত। এই দুই ধারায় জগজ্জননীকে দুভাবে উপাসনার কথা বলা হয়েছে — কন্যারূপে ও মাতৃরূপে। এই প্রসঙ্গো শশিভূষণ দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছেন: "... শাক্ত-গানগুলিকেও আবার দুইভাবে ভাগ করা যাইতে পারে, লীলা-গীতি ও বিশুদ্ধ সাধন-গীতি। আগমনী ও বিজয়াসঙ্গীতগুলি মুখ্যভাবে লীলা-গীতি। এই লীলা-গীতিগুলিরও একটি সাধনার দিক্ রহিয়াছে — যেমন রহিয়াছে বৈষ্ণব-লীলা-গীতির সাধনার দিক্। আগমনী-বিজয়া ব্যতীত অন্য গীতিগুলি বিশুদ্ধ সাধন-গীতি।"[৩]

সূচনা কালে বাংলাদেশে ছোটো বড়ো প্রায় শতাধিক শাক্ত কবির আবির্ভাব ঘটে। শাক্ত পদকর্তাদের মধ্যে সাধারণ মানুষ, রাজা, জমিদার, উচ্চ শ্রেণির কর্মচারী ছিলেন। রামপ্রসাদ সেন ছিলেন শাক্ত পদাবলির আদিকবি। রামপ্রসাদ সম্পর্কে অরুণকুমার বসুর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, "শাক্তপদের ইতিহাসে সেই আদিকবির গৌরব অবশ্যই রামপ্রসাদ সেনের। রামপ্রসাদই শাক্ত পদাবলির গোমুখতীর্থ — তাঁর কণ্ঠ নিঃসৃত গীতই নানা স্রোতোধারায় উত্তরকালের লোকজীবনকে শ্যামল করেছে। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যপদধারার এক প্রান্তে চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, অন্যপ্রান্তে রামপ্রসাদ-কমলাকান্তের স্থান।"[৪] রামপ্রসাদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে অরুণকুমার বসু কমলাকান্তের প্রসঙ্গা এনেছেন। শাক্ত পদকর্তাদের মধ্যে রামপ্রসাদের পরেই যাঁর নামটি সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয়, তিনি হলেন কমলাকান্ত। রামপ্রসাদ শাক্ত পদাবলির যে ধারার প্রবর্তন করেন, সেই ধারার সার্থক উত্তরসূরী হলেন কমলাকান্ত। সাধক কমলাকান্ত রামপ্রসাদের অনেক পরবর্তীকালের কবি। তাঁর আবির্ভাব রামপ্রসাদের মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে। কমলাকান্ত যে সময় কাব্য রচনা করেছেন বা কাব্য সাধনা করেছেন; তখন অভিভক্ত বাংলায় রামপ্রসাদের গানের প্রভাব ও প্রসার ব্যাপকভাবে ছিল। আত্মনিবেদনের একাত্মতায়, একনিষ্ঠ

© Santiniketan Sahityapath

মাতৃবন্দনায় এবং সাধন ভজনের উৎকর্ষে রামপ্রসাদের সঙ্গে কমলাকান্তের নাম উচ্চারিত হয়। প্রাবন্ধিক প্রদীপ বিশ্বাস মন্তব্য করেছেন, ‘‘কমলাকান্ত সজ্ঞানেই অগ্রজকে অনুসরণ করেছিলেন। রামপ্রসাদের গানের সূত্রটিকে কণ্ঠে ধারণ করে নিয়েছিলেন। কমলাকান্তের মধ্যে যে গীতিকার, যে সুরকার এবং যে গায়ক প্রতিভা ছিল, যা প্রথম জীবনে লেখা বৈষ্ণব পদাবলি, ‘সাধকরঞ্জনের’ মতো গ্রন্থগুলিতে আপনার পথ খুঁজে ফিরছিল, রামপ্রসাদের গানে সেই রুদ্ধ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হল। আপনার গানের প্রাণের পথ খুঁজে পেলেন তিনি। তার পর থেকে লিখে গেছেন একের পর এক গান। গানে গানে মুখরিত করে দিয়েছিলেন রাঢ়বঙ্গের রাঙামাটি। রাঢ়ের রাঙামাটির রঙেই আছে আত্ম উৎসর্গের মহান ব্যঞ্জনা। কমলাকান্তের জীবন উৎসর্গ হল শ্যামামায়ের পূজার জন্য গীতি-পুষ্প রচনে।’’[৫]

কমলাকান্তের জীবন সম্পর্কে খুব অল্প কথাই জানা যায়। কবির আদি নিবাস ছিল বর্তমান পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার অন্তর্গত অম্বিকা গ্রামে। তাঁর জন্ম সন তারিখ সঠিকভাবে জানা যায় না।[৬] তাঁর পিতার নাম মহেশ্বর, মাতার নাম মহামায়া। অম্বিকা-কালনার বিদ্যাবাগীশ পাড়ার বিখ্যাত রায় বংশের সন্তান ছিলেন কবি। কবির পারিবারিক কৌলিক পদবি সম্ভবত ছিল বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে ‘ভট্টাচার্য’ উপাধি দ্বারাই তিনি অধিক সুপরিচিত হয়েছিলেন। কালনার পূর্বোক্ত পাড়াতে তাঁদের বাস্তুভিটার কিছু অবশেষ এখনো রয়েছে। ছোটোবেলায় শিক্ষালাভের জন্য স্থানীয় টোলে তিনি ভর্তি হন। অল্পবয়সে পিতার মৃত্যু হলে তিনি মায়ের সঙ্গে মামাবাড়িতে চলে আসেন। কবির মাতুলালয় ছিল বর্তমান পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্তর্গত খানা জংশনের কাছে চান্নাগ্রামে। চান্নার সুপ্রসিদ্ধ বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে তাঁর দিনের বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত হতো। মাতৃপ্রেমে তিনি সর্বদা বিভোর হয়ে থাকতেন।তাঁর সেই তন্ময় মূর্তি দেখে সকলে অবাক হতেন। তাঁর অকৃত্রিম ভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে সেখানেই এক ব্রহ্মচারী মাতৃসাধক তাঁকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা দেন। এই গ্রামেই কবি সাধনবলে মায়ের দিব্যরূপ দর্শন করেন বলে জনশ্রুতি আছে। অনেকের মতে গোপকন্যার বেশে ও বাগদীর বেশে দেবী তাঁকে দেখা দেন। এছাড়াও লোকমুখে তাঁর দুই বিবাহের কথাও প্রচলিত আছে যদিও এই নিয়ে কোনো প্রামাণিক তথ্য কারো কাছে নেই। সমকালীন সময়ের প্রখ্যাত জীবনীকাররা তাঁর জীবনকাহিনি সম্পর্কে প্রবল উদাসীন ছিলেন এবং সেইভাবে তাঁর জীবনকথা নিয়ে গবেষণাও করেন নি। ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকার সম্পাদক তথা কবি ঈশ্বর গুপ্ত ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে রামপ্রসাদ সেনের জীবনী প্রকাশ করেন।[৭] পরবর্তী সময়ে তাঁর কলমে কমলাকান্তের জীবনকথা উঠে আসার কথা থাকলেও, তা কখনো বাস্তবের মাটি স্পর্শ করেনি। এইপ্রসঙ্গে অরুণকুমার বসুর মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ,

‘‘কমলাকান্তের জীবনোপকরণ যৎসামান্য, পরবর্তী জীবনীকারগণ এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা করেননি। ঈশ্বর গুপ্তের কবিজীবনীতে কমলাকান্তের অনুপস্থিতি লক্ষ করা মতো, তিনি কমলাকান্তের কোনো পদও সংগ্রহ করেননি।... কমলাকান্তের জীবনকাহিনী যতটুকু জানা যায় তাতে বিশেষ কোনো বৈচিত্র্য নেই, কেবল একটি আস্তিক ভক্তি ও বিশ্বস্ত সেবার পরিমিত বিবরণই কমলাকান্তের সংগীতসাধনার ইতিবৃত্ত। কমলাকান্তের প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই রামপ্রসাদের নাম উপস্থাপিত হয়, যদিও উভয়ের মধ্যে নানাদিক থেকে পার্থক্য আছে। সাধক-জীবনে কমলাকান্ত হয়তো রামপ্রসাদেরই অনুবর্তী।... সময়ের দিক থেকে রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তে অন্তত অর্ধশতকের ব্যবধান। রামপ্রসাদের মৃত্যু ঘটে অষ্টাদশ শতকের সত্তরের দশকে। কমলাকান্তের জন্ম তার দু-এক বছর পূর্বেই হয়েছিল।’’[৮]

১৩৩২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে কমলাকান্তের ‘সাধকরঞ্জন’ নামে তন্ত্রসাধনা বিষয়ক বাংলা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে খুব অল্প কথায় কমলাকান্তের জীবনকথা রয়েছে। গ্রন্থের শেষের দিকে কবি নিজের যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন,

‘‘অতঃপর কহি শুনি আত্মনিবেদন।
ব্রহ্মকুলে উপনীত স্বামী নারায়ণ।।
জন্মভূমি অম্বিকা নিবাস বর্ধমান।
শ্রীপাট গোবিন্দমাঠ গোপালের স্থান।।
প্রভু চন্দ্রশেখর গোস্বামী মহাধন।
তাঁর পদরেণু যার মস্তকভূষণ।।

© Santiniketan Sahityapath

নামেতে কমলাকান্ত ভাবি ত্রিলোচন।
ভাষা পুঞ্জে বিরচিল সাধক রঞ্জন।।"[৯]

কমলাকান্তের জীবনী নিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত আগ্রহী হয়ে না উঠলেও পরবর্তীতে অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একটি জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করেন। বইটি তাঁর সীমাহীন পরিশ্রম ও অসীম ধৈর্যের ফসল। কবির জীবন সম্পর্কে প্রচুর অনুসন্ধান করেও তাঁর জন্মস্থান, জীবনকথা, পরিবার ও সাধন স্থান সম্বন্ধে খুব অল্পই তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। কবির সঙ্গে বর্ধমান রাজবাড়ির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মহারাজ তেজচন্দ্র কমলাকান্তকে সভাপণ্ডিতের আসন দিয়েছিলেন। সম্ভবত ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি বর্ধমানাধিপ তেজচন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন, নিজ প্রতিভাবলে তাঁর সভাপণ্ডিত ও গুরু পদে আসীন হন।[১০] সুতরাং তাঁর জীবনকাল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যকাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে ধরা যেতে পারে। সমকালীন নবজাগরণের প্রাণাবেগ, ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব তাঁকে স্পর্শ করেছিল, এমন কোনো প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় না। কমলাকান্তের পৃষ্ঠপোষক তেজচন্দ্রের সময়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত হয়। ইতিমধ্যে দেশে বর্গির হাঙ্গামার অবসান ঘটেছে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরও সম্ভবত কমলাকান্ত স্পষ্টভাবে অনুভব করেন নি। তাঁর প্রতি মহারাজ তেজচন্দ্রের অনুরাগ এতই গভীর ছিল যে, তিনি নিজের পুত্র প্রতাপচন্দ্রের শিক্ষার গুরুদায়িত্ব কমলাকান্তকে দিয়েছিলেন। অচিরেই কমলাকান্ত ও প্রতাপচন্দ্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক নিয়ে পরবর্তীসময়ে মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ্র মহাতাব বাহাদুর 'কমলাকান্ত' শীর্ষক একটি নাটিকা (১৩২০ বঙ্গাব্দে) লেখেন। কবির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশত বর্ধমান রাজবংশ কমলাকান্তের স্মৃতিকে পরম ভক্তিভরে রক্ষা করেছেন। তাঁর তিরোধানের পর বর্ধমানরাজের উদ্যোগে জীবনীসহ তাঁর সমগ্র পদাবলি ('শ্যামাসংগীত') মুদ্রিত হয়েছিল ১৮৫৭ সালে। বর্ধমান রাজবাটী প্রকাশিত কমলাকান্তের পদাবলি সংগ্রহে মোট ২৬৯টি পদ আছে। তার মধ্যে ২৪৫টি শ্যামা বিষয়ক এবং ২৪টি বৈষ্ণবভাবাপন্ন রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ। শ্যামামায়ের প্রতি অনন্যসাধারণ ভক্তি ও ঐকান্তিক আত্মনিবেদনের নিদর্শন হিসাবে কমলাকান্তের সংগীতগুলি পরম আদরের সামগ্রী। ১২৯২ বঙ্গাব্দে শ্রীকান্ত মল্লিক যে 'কমলাকান্ত পদাবলি' প্রকাশ করেন, তাঁর মূল উপাদান তিনি বর্ধমান রাজবাটীর ১৮৫৭ সালের প্রথম সংস্করণের 'শ্যামাসংগীত' থেকে গ্রহণ করেছেন।

মহারাজ তেজচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন বলেই আক্ষরিক অর্থে তিনি সভাকবি ছিলেন। সে সভা কৃষ্ণচন্দ্রের সভার মতো বিলাস-প্রাচুর্যে কিংবা কর্দমাক্ত জীবনাচারে পরিপূর্ণ ছিল না। তাই নাগরিক জীবনের কোনো আদিরসাত্মক উল্লাস কমলাকান্তের পদে প্রতিফলিত হয় নি। রাজসভার আড়ম্বর-জৌলুষ, উচ্ছৃঙ্খল বিলাস-ব্যসন তাঁকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেনি। ভারতচন্দ্রের মতো রামপ্রসাদও যুগের হাওয়া এড়াতে পারেন নি, গর্হিত রুচির স্পর্শ তাঁর কাব্যেও আছে। কমলাকান্ত এদিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে হেঁটেছেন, অশ্লীলতার সামান্য ছোঁয়াও তাঁর লেখনী স্পর্শ করেনি। কমলাকান্তের বৈচিত্র্যহীন সারস্বত সাধনায় তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ সাত্ত্বিক জীবনযাপন, সুনিয়ন্ত্রিত বিধিসম্মত আচার, শান্ত শীতল সহজ-সরল জীবন সবই প্রতিফলিত হয়েছে। রাজসভার কবি বা রাজার সভাপণ্ডিত অপেক্ষা রাজবংশের কুলগুরু হিসেবেই তিনি অধিক পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে কোনো প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় নি। বিশিষ্ট গবেষকরা অনুমান করেছেন, সাধককবি কমলাকান্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে কোটালহাটের আশ্রমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন: "ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক পর্যন্ত যিনি জীবিত ছিলেন, যিনি রাজবংশের গুরু বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন এবং জীবিতকালেই মহাসাধক বলিয়া যাঁহার নাম প্রচারিত হইয়াছিল, তাঁহার জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য ঘটনা সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই — ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।"[১১]

শাক্ত পদাবলির উল্লেখযোগ্য একটি পর্যায় হলো 'আগমনী'র পদগুলি। শরৎ ঋতুতে গিরিরাজ হিমালয়কন্যা উমার পতিগৃহ অর্থাৎ শিব গৃহ কৈলাস থেকে পিতৃগৃহ হিমালয়ে আগমনের সঙ্গে সম্পর্কিত যে পদগুলি রচিত হয়েছে, সেগুলিকে আগমনী পর্যায়ের

© Santiniketan Sahityapath

পদ বলে। আগমনীর পদগুলিতে উমার পিতৃগৃহে আসার আগের প্রবল উত্তেজনা-উৎসাহ, পিতৃগৃহে আসা ও নির্দিষ্ট সময় শেষে উমার স্বামীগৃহে ফিরে যাওয়ার কথা কল্পনায় মা মেনকার হৃদয়ের নানা উত্থান-পতন প্রাধান্য পেয়েছে। মা মেনকা বাঙালি মায়ের সাক্ষাৎ প্রতিবিম্বরূপে চিত্রিত হয়েছেন। আগমনীর পদগুলিতে তৎকালীন সমাজজীবনের নিষ্ঠুর এক প্রথার প্রতিফলন ঘটেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলায় অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে গৌরীদানপ্রথা বর্ণাশ্রমপ্রথা প্রভাবিত সমাজের মধ্যে ভয়ানক পরিস্থিতি উৎপন্ন করেছিল। সাধারণ গরিব বাবা-মায়ের পক্ষে উপযুক্ত পাত্রের হাতে কন্যাদান করা সবসময় সহজ ছিল না। অসহায় পিতামাতা তাঁদের আট-নয় বছর বয়সী শিশুকন্যাকে সমাজের শ্যেনদৃষ্টির হাত থেকে বাঁচানোর অভিপ্রায়ে ও কুলরক্ষার্থে অপাত্র, কুপাত্র, মৃত্যু পথযাত্রী বৃদ্ধ বা কপর্দকহীন ব্যক্তির হাতে তুলে দিতে একপ্রকার বাধ্য হতেন। এর ফলে হয়তো সমাজের দৃষ্টিতে কুলমর্যাদা বেঁচে যেতো কিন্তু পিতামাতার হৃদয় জ্বলে যেতো। অপরদিকে পিতামাতার আদরের ধন কন্যাকে বৃদ্ধবরের গৃহে সতীনের সঙ্গে সংসার করতে হতো। এইভাবে বিবাহিত কন্যাগুলির দুঃখ-কষ্টের কোনো সীমা থাকত না। অসহায় বাবা-মা সারাক্ষণ মেয়ের কষ্টের কথা কল্পনা করে নীরবে অশ্রুপাত করতেন। তাঁদের সেই অসহায় অবস্থার কথা কল্পনামাত্র দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে ওঠে। সবচেয়ে করুণ অবস্থায় দিন কাটত মেয়ের মায়ের, তাদের কষ্টের কোনো সীমা ছিল না। মেয়ের আসন্ন দুর্বিষহ জীবন সম্পর্কে ভেবে মায়ের বুক কেঁপে উঠত, সমাজের সেই নিয়ে যদিও কোনো ভাবনা ছিল না। সামাজিক নিয়ম ছিল দূর্গাপুজোর সময় মাত্র তিনদিনের জন্য বাপের বাড়িতে বধূকে নিয়ে আসতে হবে। এই তিনটি দিনের (সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী) জন্য মায়ের ব্যাকুল প্রতীক্ষা ও ব্যথাকাতর হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে 'আগমনী' অংশে। এই পর্যায়ের পদগুলিতে বাঙালি পরিবারের প্রাত্যহিক জীবনের একটি অন্তরঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। কবিদের কল্পনায় মহেশ্বর হয়েছেন জামাতা, জগজ্জননী উমা ঘরের মেয়ে, মেনকা হয়েছেন বাৎসল্যময়ী গৃহজননী। আগমনী পর্যায়ের পদগুলিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। এই প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মর্তব্য,

"কমলাকান্তের আগমনী-বিজয়া পদগুলি বিষয়ের বিন্যাসক্রমে গার্হস্থ্য বাৎসল্যের একটি সকরুণ নাট্যরূপ বলে মনে হয়। পরের ঘরে প্রেরিত কন্যাকে শরৎ-নিশিশেষে জননীর স্বপ্নে দেখার মুহূর্ত থেকে এই লীলানাট্যের সূচনা। তারপর কন্যাকে একবার চোখে-দেখার উদ্‌বেগে জানাও হয়। শেষপর্যন্ত পুত্রকন্যাসহ উমাকে ঘরে চারদিন পরে আবার চোখের জল মুছে তার মঙ্গলকামনা করে জননী তাঁকে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার অনুমতি দেন। এখানেই এই সংসারস্নেহনাটিকার যবনিকাপতন।"[১২]

মেয়ের চিন্তায় রাতে মা মেনকার ঘুম আসে না। সহ্য করতে না পেরে স্বামী গিরিরাজকে মাঝে মাঝে নানা অভিযোগ করেন, কটূ কথা বলেন। শরৎকালের রজনী শেষে গিরিরাজ-পত্নী মেনকা স্বপ্নে কন্যাকে দেখে ভয় পেয়ে ঘুমন্ত স্বামীকে ডেকে বলেন —

"আমি কি হেরিলাম নিশি-স্বপনে!
গিরিরাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে।
এই এখনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথায় গেল হে..."[১৩]

এরপর উৎকণ্ঠিতা মা স্বপ্নে মেয়েকে কেমন দেখেছেন, তারও বর্ণনা আছে। রাত্রে একবার স্বপ্নে মেয়ে উমাকে দেখে মা মেনকার মনে প্রবল উৎকণ্ঠা জেগে উঠেছে। স্বামীর প্রতি মেনকার অভিযোগ যে, তিনি কন্যা সম্পর্কে উদাসীন, মেয়ের কথা একদমই ভাবেন না। 'ওহে গিরিরাজ, গৌরী অভিমান করেছে' — পদটিতে কৌলীন্যপ্রথা জর্জরিত বাঙালি সমাজে কুলীন জামাতার গৃহে কন্যার প্রতিদিনের প্রাণান্তকর জীবনযাত্রার কথা মেনকার জবানীতে উদ্ভাসিত হয়েছে। কৌলীন্যপ্রথার প্রবল দাপট ও সেই কারণে বহুবিবাহের নিন্দনীয় দিকটিকে কবি কাব্যরূপ দিয়েছেন উক্ত পদে। আগমনী পর্যায়ের অন্য একটি পদে কমলাকান্ত তৎকালীন সমাজে নারীদের অবস্থান ও তাদের অব্যক্ত যন্ত্রণার কথা চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন —

"কামিনী করিল বিধি, তেঁই হে তোমারে সাধি,
নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে।"[১৪]

মায়ের মন কন্যাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়েছে, কোনোমতে তিনি সেই ব্যাকুলতার উত্তাল ঢেউকে নিয়ন্ত্রণ করে স্বামীকে কন্যাকে গৃহে

© Santiniketan Sahityapath

আনার কথা বলেছেন। কয়েকটি পদে বাঙালি মায়ের প্রতীক্ষার চিত্র সুনিপুণভাবে কমলাকান্ত ফুটিয়ে তুলেছেন। আগমনী পর্যায়ের পদে মেনকার দুঃখে আমরা সমব্যথী হয়ে উঠি শুধুমাত্র কমলাকান্তের লেখনীর গুণে। একটি পদে দেখি উমার বিধুমুখ না দেখে মেনকার ঘর অন্ধকারাচ্ছন্ন —

"গিরি প্রাণ-গৌরী আমার।
উমা-বিধিমুখ না দেখি বারেক, এ ঘর লাগে আন্ধার।"[১৫]

মা মেনকাকে কন্যার বিরহে বিষণ্ণ হতে দেখে কমলাকান্ত তাঁকে শান্ত থাকার উপদেশ দিয়েছেন। উমাকে আনতে গিরিরাজ হরপুরে গমন করেন। এরপর 'ওহে হর গঙ্গাধর, কর অঙ্গীকার, যাই আমি জনক-ভবনে' — দেখি উমা পিতৃগৃহে যাওয়ার জন্য স্বামীর অনুমতি চেয়েছেন, একইসঙ্গে তিনদিন পরেই যে আবার ফিরে আসবেন, সেকথাও স্বামীকে জানিয়েছেন। 'গিরিরাণি, এই নাও তোমার উমারে' পদটিতে গিরিরাজ হিমালয় উমাকে এনে মেনকার হাতে সমর্পণ করেছেন। গিরিরাজ হিমালয় তাঁর কন্যা উমাকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন — এ সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দিত মেনকা পাগলিনীর মতো ছুটেছেন প্রাণের থেকে প্রিয় মেয়েকে দেখার জন্য। মা-মেয়ের দীর্ঘদিন পর মহামিলন হয়েছে।

'আগমনী'র মতো 'বিজয়া' পর্যায়ের পদ রচনায়ও কমলাকান্ত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। বিজয়া হলো আগমনীর সম্ভাব্য পরিণতি। জন্ম হলে যেমন মৃত্যু আছে; ঠিক তেমনি আগমনী হলে, বিজয়া হবেই। সপ্তমীর সকালে মা ও মেয়ের বহুদিনের প্রতীক্ষিত, কাঙ্ক্ষিত মিলনে উৎসবের বাজনা বেজে ওঠে। ঘরে ঘরে বাঙালি সারা বছরের দুঃখ-দুর্দশা ভুলে আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠে। এই আনন্দের তিনদিন খুব দ্রুত আনন্দ, উল্লাস, হাসিতে কেটে যায়। নবমীর রাতে জননীর হৃদয় কেঁপে ওঠে আসন্ন কন্যা-বিচ্ছেদ কল্পনায়। বাস্তবটা অনেক আগে থেকেই জানা থাকলেও মায়ের মন স্বাভাবিকভাবেই তা মানতে চায় না। 'যেতে নাহি দিব কিন্তু যেতে দিতে হয়' — এই ভাবনা মায়ের সদ্য আলোকিত মনে অন্ধকার নামিয়ে আনে। 'বিজয়া'র দুটি প্রধান দৃশ্য — একটি নবমী নিশির দৃশ্য, অপরটি দশমী প্রভাতের দৃশ্য। প্রথমটি আসন্ন বিচ্ছেদ যন্ত্রণার সত্যকে অস্বীকার করতে চায়, দ্বিতীয়টি এনে দাঁড় করায় কঠিন বাস্তবের সামনে। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিনদিন পিতৃগৃহ হিমালয়ে অবস্থান করার পর উমার আবার পতিগৃহ কৈলাসে ফিরে যাবার সঙ্গে সম্পর্কিত যে পদগুলি রচিত হয়েছে, সেগুলিকে বিজয়া পর্যায়ের পদ বলে। দশমীর সকালের আগে নবমীর রাতে সম্ভাব্য বিচ্ছেদের কথা ভেবে মা মেনকার হৃদয় দুঃখে কাতর হয়েছে। নবমীর রাতে তাই মায়ের কাতর প্রার্থনা কমলাকান্তের বিজয়ার পদে ধ্বনিত হয়েছে এইভাবে —

"ওরে নবমী-নিশি, না হইও রে অবসান।
শুনেছি দারুণ তুমি, না রাখ সতের মান।"[১৬]

প্রকৃতির নিয়মে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে, পেরিয়ে যায় নির্দিষ্ট সময়; মাতৃবেদনা বোঝার দায় তার নেই, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। এইভাবে মায়ের মনের সব অবরোধের প্রাচীর টপকে নবমী নিশি চলে যায়, রাত শেষে চলে আসে দশমীর ঝলমলে সকাল বিচ্ছেদের কালো বার্তা নিয়ে। মায়ের তীব্র প্রার্থনা সত্ত্বেও নবমী নিশির অবসান ঘটেছে — "কি হলো, নবমী নিশি হৈলো অবসান গো।"[১৭] গৌরীর দিকে তাকিয়ে মায়ের মন যেমন উদাস হয়েছে, তেমনি মায়ের কথা ভেবে উমার মনও উদাস হয়েছে। মায়ের মন কিছুতেই মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে চায়নি, তবে তিনি নিরুপায়। পদকর্তা কমলাকান্ত মেনকাকে বলেছেন হরকে বুঝিয়ে বলতে যে, নিজেকেই নিজের মান বজায় রাখতে হয়। কয়েকটি পদে মায়ের প্রতিবাদী সত্তার প্রকাশ ঘটতেও দেখি।

তিনদিন মিলন-উৎসব সমারোহের পর বিজয়াদশমী তিথিতে গৃহের ভিতরে-বাইরে অসীম বেদনা ও চরম শূন্যতার ছায়া ঘনীভূত হয়। কৃষ্ণবিরহে শোকাকুলা রাধার বেদনার্ত জীবনের করুণ সংগীত ধ্বনিত হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলির মাথুর পর্যায়ের পদগুলিতে। ঠিক তেমনি কমলাকান্ত বিরচিত শাক্ত পদাবলির পদগুলিতে মাতৃহৃদয়ের ক্রন্দন ও বেদনা উঠে এসেছে। মাতৃহৃদয় নিঙরে সব স্নেহ, ব্যাকুলতা, উদ্বেগ ও বেদনা উছলে পড়েছে কমলাকান্তের কলমে। দৈবিক মহিমার চেয়ে মানবিক বেদনায় ব্যথিত, ক্লান্ত, বিধ্বস্ত রূপটি কমলাকান্তের

© Santiniketan Sahityapath

লেখনীতে ফুটে উঠেছে। স্বামীগৃহে গমনোদ্যত উমার প্রতি মেনকার প্রশ্ন 'বোলে যাও, আসিবে আর কতদিনে এ ভবনে' — এ প্রশ্ন শুধুমাত্র মেনকার নয়, এ প্রশ্ন বাংলার প্রতিটি জনম দুঃখিনী মায়ের; যারা মেয়েকে পতিগৃহে পাঠিয়ে দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তে তার প্রত্যাগমনের আশায় পথ চেয়ে থাকেন। সাধক কমলাকান্ত তাঁর রচিত বিজয়ার পদগুলিতে মাতৃহৃদয়ের ভাববৈচিত্র্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরেছেন। এগুলির মধ্যে তত্ত্বকথার পাশাপাশি মানবিক অনুভূতির অকৃত্রিম প্রকাশ ঘটেছে। আগমনীর ক্ষণস্থায়ী সুখ, বিজয়ার বিরহবেদনাকে আরো গভীর করে তুলেছে। 'মা কি ও কেমন', 'জগজ্জনীর রূপ' ও 'ভক্তের আকুতি' পর্যায়ের পদেও কমলাকান্ত নিজের প্রতিভার ছাপ রেখেছেন।

রামপ্রসাদ শাক্ত পদাবলির যে ধারার প্রবর্তন করেছিলেন, কমলাকান্ত ছিলেন তারই উত্তরসাধক। কমলাকান্তের ভূমিকায় প্রায় তিনশ শাক্তপদ পাওয়া গেছে। পদগুলির মধ্যে আগমনী ও বিজয়ার পদগুলি উৎকৃষ্ট রচনা। কবি হিসেবে কমলাকান্তের কাব্যপ্রতিভা চমকপ্রদ না হলেও তাঁর কণ্ঠে মাতৃসাধনার যে ব্যাকুলতা সুর হয়ে উঠেছে, তা সংগীতে পল্লবিত হয়ে সাধারণের হৃদয়ার্তিতে পরিণত হয়েছিল। জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর ভাষায়: ''কমলাকান্তের পদাবলি গীতি কবিতার মতো আস্বাদ্য, কেবলমাত্র আবৃত্তি করিয়াও তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন সম্ভব। সুনির্বাচিত শব্দের ধ্বনি-ঝঙ্কার স্বভাঃবতই কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করে। পদগুলি সত্যই 'Best words in best order' এগুলি এক একটি নিটোল গীতিকবিতা। শিল্পীর সৌন্দর্য্য-বোধ, সুনির্ব্বাচিত শব্দের প্রতি অনুরাগ, শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের বিচিত্র কারুকার্য্য কমলাকান্তের এই পদাবলিকে গাঢ়বন্ধ ভাবগূঢ় গীতিকবিতার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।''[১৮]

কমলাকান্তের কয়েকটি শ্যামাসংগীত বাংলা শাক্ত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। কোনো কোনো পদ রামপ্রসাদের চেয়েও উৎকৃষ্ট। রামপ্রসাদ শাক্ত পদাবলির জনক। পরবর্তীকালে এই ধারায় অনেক কবির আবির্ভাব হলেও কমলাকান্তই একমাত্র কবি যিনি কালজয়ী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।[১৯] কমলাকান্ত ভারতচন্দ্রের মতো রাজসভার কবি ছিলেন। তবে রাজসভার আড়ম্বর, চাকচিক্য, জৌলুস তাঁকে স্পর্শ করেনি। তিনি সাধকের আসনে বসে আত্মমগ্ন হয়ে নিরন্তর সাধনা করেছেন। শাক্ত পদ রচনা ছিল তাঁর সাধনার অন্যতম মাধ্যম। বাংলা শাক্ত সাহিত্য তথা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কমলাকান্ত নিজগুণে তাঁর চিরস্থায়ী আসন গ্রহণ করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১। 'শক্তিগীতি পদাবলি', অরুণকুমার বসু, অভিযান পাবলিশার্স, প্রথম অভিযান সংস্করণ জানুআরি ২০১৯, ১০/২এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা, পৃ. ১৯ (অতঃপর গ্রন্থটি 'শক্তিগীতি পদাবলি' নামে উল্লিখিত।)

২। ওই, পৃ. ৪৮

৩। 'ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য', শশিভূষণ দাশগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৬৭, পৃ. ২২৮

৪। 'শক্তিগীতি পদাবলি', পৃ. ১৭৮

৫। 'রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত: একটি সাহিত্যিক বিশ্লেষণ', ড. প্রদীপ বিশ্বাস, Pratidhwani the Echo, A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science, ISSN: 2278-5264 (Online), Volume: VII, Issue: IV, April 2019, পৃ. ৩

৬। ''সাধকচূড়ামণি কমলাকান্তের জন্মস্থান বর্ধমান জেলার অন্তর্গত অম্বিকা কালনা। তিনি প্রায় ১৫০ বছর পূর্বে আবির্ভূত হন। তাঁহার জন্মতারিখ জানা যায় নাই; তবে মহারাজাধিরাজ মহাতাপচাঁদ বাহাদুরের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত 'কমলাকান্ত-পদাবলি' গ্রন্থ-পৃষ্ঠে দেখা যায় যে, ১২১৬ বঙ্গাব্দে মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর সাধকপ্রবরকে অম্বিকা হইতে বর্ধমান নগরে লইয়া আসেন; তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৪০ এর অধিক। তিনি শৈশবে পিতৃহীন হন; তাঁহারা দুই সহোদর, তন্মধ্যে কমলাকান্ত জ্যেষ্ঠ। পিতার তাদৃশ ভূসম্পত্তি না থাকায় তাঁহার মাতা পুত্র দুইটিকে লইয়া চান্নার পিত্রালয়ে যান। কমলাকান্তের মাতুলের নাম নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য।... এই সময়ে তাঁহার মাতুল, তাঁহার উপনয়নক্রিয়া সম্পাদন করেন। কথিত আছে, ইহার পরই তিনি বিলাস ত্যাগ করেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণে কৃতসংকল্প হন। পুত্রের এই অবস্থা লক্ষ করিয়া কমলাকন্তের মাতা লাডুক্কার ভট্টাচার্য মহাশয়ের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। লাডুক্কা চান্না হইতে প্রায় ৬ ক্রোশ দূরে, বর্ধমানের অতি সন্নিকট। মাতার অনুরোধে কিছুদিন সংসারে বাস করিলেও তিনি সন্ন্যাসীর ন্যায় অবস্থান করিতেন।... চান্নায় যে সকল প্রবাদ আছে, তাহাতে মনে হয় যে সাধক-প্রবর বিঁশালাক্ষী দেবীর মন্দিরস্থিত

© Santiniketan Sahityapath

পঞ্চমুণ্ডী আসনে সিদ্ধিলাভ করেন।" ['সাধক কমলাকান্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সাধক-রঞ্জন বৃত্তান্ত', প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সাধক কমলাকান্ত জীবনী পদাবলি ও সাধক-রঞ্জন', সম্পাদনা প্রশান্ত সেন, পাতাবাহার, ১৯পি অবিনাশচন্দ্র ব্যানার্জি লেন, কলকাতা, প্রথম পাতাবাহার সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৭, পৃ. ১১ (অতঃপর 'সাধক কমলাকান্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সাধক-রঞ্জন বৃত্তান্ত' নামে উল্লিখিত।)]

৭। "... ঈশ্বর গুপ্তের লেখাই এবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক। রামপ্রসাদের জীবনী সম্বন্ধে মাত্র তিন জন উল্লেখযোগ্য গবেষণা করিয়াছেন — সর্ব্বাগ্রে গুপ্তকবি, তৎপর দয়ালচন্দ্র ঘোষ (১২৫৯-৯১ বঙ্গাব্দ) ও সর্ব্বশেষে অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। গুপ্তকবি ১২৬০ সনের ১লা পৌষসংখ্যা সংবাদ প্রভাকরে লিখিয়াছেন (পৃ. ৯): "পঞ্চবিংশতি বৎসর অতীত হইল আমরা রামপ্রসাদী পদ্য সংগ্রহ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি", অর্থাৎ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতেই তিনি রামপ্রসাদ সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। তৎকালে রামপ্রসাদের পুত্র পৌত্রাদি বহু ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন জীবিত ছিলেন, যাঁহাদের নিকট গুপ্তকবি অল্পায়াসে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য জানিতে পারিয়াছিলেন সন্দেহ নাই।... দুঃখের বিষয়, গুপ্তকবি পুস্তকাকারে রামপ্রসাদের জীবনী ও রচনা ইচ্ছা সত্ত্বেও মুদ্রিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। রামপ্রসাদ সম্বন্ধে গুপ্তকবির লেখা যেটুকু মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার প্রামাণ্য বিনা কারণে কিছুতেই অগ্রাহ্য করা যায় না। রামপ্রসাদের জন্ম-মৃত্যুর কাল নির্দ্দেশ করিয়া তিনি এক স্থলে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন (সংবাদ প্রভাকর, ১লা পৌষ ১২৬০, পৃ. ৯): — "৬০ বৎসর বয়সের কিঞ্চিত পরেই রামপ্রসাদ সেন মায়িক সংসার পরিহার পূর্ব্বক নিত্যধাম যাত্রা করেন। তাঁহার মৃত্যুর দিন গণনা করিলে ৭২ বৎসরের অধিক হইবেক না।" গুপ্তকবি লিখিয়াছেন, শ্যামাপ্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন তাঁহার মৃত্যু হয়।" ('সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', নবম খণ্ড, 'কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন', দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সম্পাদক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা, প্রথম একত্রিত সংস্করণ: মাঘ ১৪২৫ জানুআরি ২০১৯, পৃ. ৩৫)

৮। 'শক্তিগীতি পদাবলি', পৃ. ২০৬

৯। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', তৃতীয় খণ্ড: দ্বিতীয় পর্ব, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৬, পৃ. ৩৩৭(অতঃপর গ্রন্থটি 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' নামে উল্লিখিত)

১০। 'কমলাকান্ত সিদ্ধিলাভ করিবার পর তাঁহার খ্যাতি শুনিয়া তৎকালীন বর্ধমানের মহারাজা তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর তাঁহাকে সভাপণ্ডিতরূপে সাদরে গ্রহণ করেন এবং বর্ধমানের পশ্চিমে বাঁকা নদীর ধারে কোটালহাটে কালীমন্দির নির্মাণ করাইয়া তথায় তাঁহাকে বাস করান। এখানেও পঞ্চমুণ্ডী আসন আছে এবং পূর্বে মহাসমারোহে এখানে কালীপূজা হইত। যুবরাজ প্রতাপচাঁদও সাধক-প্রবরকে গুরুবৎ ভক্তি করিতেন।' ('সাধক কমলাকান্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সাধক-রঞ্জন বৃত্তান্ত', পৃ. ১৩)

১১। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', পৃ. ৩৩৭

১২। 'শক্তিগীতি পদাবলি', পৃ. ২১৬-২১৭

১৩। 'শাক্ত পদাবলি' (চয়ন), অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বাদশ সংস্করণ ২০১০, পৃ. ৪

১৪। ওই, পৃ. ৯

১৫। ওই, পৃ. ১১

১৬। ওই, পৃ. ৪২

১৭। ওই, পৃ. ৪৪

১৮। 'শাক্ত পদাবলি ও শক্তি সাধনা', জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, ডি এম লাইব্রেরি, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৩৭০ (বঙ্গাব্দ), পৃ. ২৭৩

১৯। 'কমলাকান্ত বাংলা শাক্তপদাবলির একজন স্মরণীয় কবি ও সাধক। কবিত্বে যেমন তিনি রামপ্রসাদের সমকক্ষতা অর্জন করেছিলেন, মাতৃসাধনার গূঢ় পথেও তাঁর সিদ্ধি ছিল তেমনই প্রশ্নাতীত। জনশ্রুতি, স্থানীয় মন্দিরে পঞ্চমুণ্ডীর আসন রচনা করে সাধন-ভজন করতেন তিনি। প্রথম জীবনে 'সাধক-রঞ্জন' নামে তন্ত্রসাধনা- বিষয়ক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, ছন্দোবন্ধ পদ্যের আঙ্গিকে। তাঁর চরিত্র ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে বর্ধমানের রাজা তাঁকে সভাপণ্ডিতের পদ দান করেন। কমলাকান্তের রচিত আগমনি ও বিজয়ার গান বাংলার ভক্তিকাব্যের ধারায় এক অমলিন সম্পদ। বাঙালির প্রাণে এই গান চরম দুঃখের মধ্যেও এনে দেয় গভীর সান্ত্বনার উপলব্ধি, সংসার-গরলে দেয় অমৃতের স্নেহস্পর্শ।' (প্রসঙ্গত অংশ দ্রষ্টব্য, প্রশান্ত সেন, 'সাধক কমলাকান্ত জীবনী পদাবলি ও সাধক-রঞ্জন', সম্পাদনা প্রশান্ত সেন, পাতাবাহার, ১৯পি অবিনাশচন্দ্র ব্যানার্জি লেন, কলকাতা, প্রথম পাতাবাহার সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৭)

—

© Santiniketan Sahityapath